PARTHASARATHI print format: RNI 5158/ 60: 1st e- magazine
published on 24.04.2020 during Nationwide Lockdown.
Mail id: info@parthasarathipatrika.com

চতুর্থ অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই শ্রাবণ ১৪২৭ / 24.07.2020

-: সম্পাদক :-

সুনন্দন ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক
প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
পত্রে শ্রীপ্রীতিকুমার	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
অরবিন্দ প্রসঙ্গ	শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু
স্বামী বিবেকানন্দ : মহান রাষ্ট্রহিতৈষী	শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র
বিদ্রোহ	শ্রী প্রকাশ অধিকারী
দাও গো আমায়	স্বামী তারানন্দ
মুখোশ ছিঁড়ে	সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

প্রীতি-কণা

"যদি কর্মে সফলতা আনতে চাও, ভাগ্যের দোষ দিও না। ভাগ্যকে গড়ে তোলো তোমার কর্মের দ্বারা। কর্ম করো পুরুষকার দিয়ে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে; আর পূর্ণভাবে নির্ভর করো ঈশ্বরের উপর। তাঁর কৃপা লাভ করলে সব কিছুই সফল হবে।"

আমি যখন মানালিতে পর্বতারোহণ বিষয়ে শিক্ষার জন্য যাই, তখন আমাকে শ্রী প্রীতিকুমার প্রায় প্রতিদিনই একটি করে চিঠি দিতেন। সে চিঠি দুটি প্রকাশ করেছি। এবার যে চিঠি প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি ১৯৬৯ সালে লেখা। আমি NCC College for Women, Gwalior-এ Refresher Course করতে গিয়েছিলাম। তার দুটি চিঠি আজ তুলে ধরছি।

১৭-৬-১৯৬৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

তোমার আসবার প্রস্তুতি আমার হৃদয়ে স্পন্দন জাগাতে শুরু করেছে। আজ ১৭ তারিখ, আর নয় দশ দিন বাকী আছে। সত্বর এসে পড় এবং সংসারের ভার নিয়ে আমাকে মুক্ত করো।

মহারাজার মায়ের প্রতি টান ষোল আনা। তবে সময় বড় কম যার জন্য চিঠি লিখতে পারেন না। লাইব্রেরীর বইগুলি তো শেষ করতে হবে! দীঘা মহারাজকে আনন্দ দিয়েছে। বড় মহারাজ আনন্দ পান নি। কত তাড়াতাড়ি ওই পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আপন আলয়ে ফিরবেন এই ছিল প্রবল তাড়না। দীঘার সব অবস্থা দেখে এসেছি। এবার যখন তখন আমরা তিনজন যেতে পারব। (এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি – আমরা তিনজন পরবর্তী জীবনে কখনো কোথাও যেতে পারিনি। কারণ শ্রী প্রীতিকুমারের সঙ্গ সাহচর্য এত লোভনীয় ছিল যার জন্য অনেকেই কোথাও গেলে সঙ্গে থাকতেনই। আমি আর বাপী এ বিষয়ে নীরব থেকেছি ভয়ে, পাছে আমাদের কেউ স্বার্থপর ভাবে। এখন মনে হয় একটু

স্বার্থপর হলে বোধহয় ভাল হতো। আমাদেরও তো কিছু পাবার অধিকার ছিল)।

দীঘা আমার ভাল লাগে। ভাল লাগে শুধু ঐ সমুদ্রের জন্য। তোমার যেমন পাহাড় পর্বত, আমার তেমন সমুদ্র। যেমন ওর বিশালতা তেমন ওর গভীরতা। এই দুইয়ের ভিতর আমি পাই অনেক কিছু। সমুদ্রের যে ঢেউ তা আমার কাছে একটি বিশেষ অর্থ বহন করে আনে। সমুদ্রের গর্জনের ভিতর ওঁঙ্কার ধ্বনি শুনতে পাই।

কবে কখন ঠিক আসবে জানাবে। ২৪ তারিখের পর আর চিঠি দেব না .....

আদর জেনো। ইতি -

শ্রী প্রীতিকুমার

*****

১৬-৬-৬৯

অভিন্নহৃদয়েষু,

এইমাত্র চিঠি পেলাম। আর একটি চিঠিও Express করেছি। তোমার সবকিছু ভালো হবে। চিন্তা করবার কিছু নেই। আমি তো আছি। তাছাড়া, যে পরম ঈশ্বর আমাদের ঘিরে আছেন, তিনিও তোমাকে ছায়ার মত আগলে আছেন। ভাবনা কি? কর্ম করবার সময় হা হুতাশ নয়। কর্মই শুধু করতে হয়। সৈনিক জীবন বেছে নিয়েছ। জীবনের সকল দুঃখ সুখ ভুলে যেতে হয়। শুধু থাকে কর্তব্য, দেশ ও দশের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা।

সব সময় একটি কথা মনে রাখতে হয়। আমরা ঁমায়ের প্রেরিত যোদ্ধা। আমরা ঁমায়ের লীলার সহচর। জীবনে যদি সব অবস্থায় এই ভাবকে বজায় রাখা যায় তাহলে দেখবে দুঃখ ও ব্যথা ভয়ে পালিয়ে যাবে। তোমার জীবনে দুঃখ কোথাও নেই। আমি তো মনেপ্রাণে এক হয়ে আছি তোমার সঙ্গে। তোমার তো কিছু ভাবনা থাকার কথা নয়। তোমার দেহ-মন-প্রাণ উন্মুক্ত করে দাও। দেখবে সেখানে আমার প্রবেশ, স্পর্শ ও নিবিড় ভাবে প্রাণে প্রাণে মিলন। ---

আদর নিও। ইতি –

শ্রী প্রীতিকুমার

অরবিন্দ প্রসঙ্গ **শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসু**

"কাছের মানুষ অরবিন্দ"-এই নামের কোনও প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা সত্যই কঠিন, কারণ অরবিন্দ চিরদিনই দূরের মানুষ। অরবিন্দ ঘোষ বা শ্রীঅরবিন্দ – কোন রূপেই তিনি জনগণের মানুষ নন - এবং যেহেতু সবর্দাই নিজের জগতে বাস করেছেন, তাই দৈনন্দিন প্রাণোত্তাপে পূর্ণ মানুষকে আমরা তাঁর বিষয়ক রচনাগুলি থেকে খুঁজে পাই না। তিনি সত্যই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র - প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। একদিন যখন তাঁর নাম বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিদ্যুৎ শিহরণ আনতো তখনো তাঁকে সন্নিধানে পায়নি সাধারণে। সুতরাং অরবিন্দের জীবনীকার যদি কেউ হতে চান, তাঁকে তাঁর বহিরঙ্গ কিছু কীর্তিকথার নিবেদনে এবং ধর্ম জীবন সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনাতেই প্রধানতঃ সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

তবু আমরা যারা সাধারণ মানুষ- যারা মহাপুরুষের মধ্যেও সাধারণ মানুষকে চাই- আমরা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মানবিক রূপকে দেখার আকাঙ্খা দমন করতে পারি না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রায়শঃ হতাশ হতে হয় – নিতান্তই তথ্যাভাব – অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ রূপ-চিত্রণ প্রায় মেলে না, পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সংলাপের বিবরণ যাঁরা লিখেছেন, তাঁরাও এক্ষেত্রে যথেষ্ট উপাদান দিতে পারেননি - তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের কথাবার্তা দিয়েছেন কিন্তু শ্রী অরবিন্দকে দেন নি।

এমনই পরিস্থিতিতে অনেক দিনের পুরনো একটি বই হাতে পড়ল- বইটি আবার পড়লাম এবং খুব খুশি হলাম। বইটির নাম "অরবিন্দ প্রসঙ্গ", লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায়।

দীনেন্দ্র কুমার রায় বাংলাদেশে বিস্মৃত সাহিত্যিক। এখনো যেটুকু বেঁচে আছেন তা ব্লেক কাহিনীর জন্য, তা তাঁর পেটের দায়ের সেকেন্ড হ্যান্ড সৃষ্টি। এই দীনেন্দ্র কুমার যে অনবদ্য পল্লীচিত্রের লেখক- সেকথা কজনের জানা আছে? কথায় ছবি আঁকতে মানুষটির বিশেষ ক্ষমতা ছিল।

বিলেতে শিক্ষা শেষ করে, বহু বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে, এবং মাতৃভাষা প্রায় না জেনে অরবিন্দ দেশে ফিরেছিলেন, তারপর বরোদা রাজ্যে চাকরি নিয়ে ছিলেন। বহু ভাষাবিদ্ দেশপ্রেমিক এই মানুষটিকে মাতৃভাষা না জানার লজ্জা বিঁধেছিল। দীনেন্দ্র কুমার রায় তাঁর বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে বরোদায় একত্র দুবছর কাটিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কিছু কথা তিনি 'অরবিন্দ প্রসঙ্গের' মধ্যে লিখেছেন।

বইটি ক্ষুদ্রাকার; পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রথম সংস্করণে মাত্র ৮৪। তার মধ্যেও ইতস্ততঃ নানা কথা জুড়ে আছে অনেকখানি জায়গা। সাক্ষাৎ অরবিন্দ কথা ৪০ পৃষ্ঠাও বোধ হয় হবে না। কিন্তু ঐ কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে অরবিন্দের যে নিকট-ছবি পাই, তা অন্যত্র দুর্লভ বলে অত্যন্ত মূল্যবান, অন্ততঃ আমাদের মত বাহ্যসুখী মানুষের কাছে।

দীনেন্দ্র কুমারের লেখাটি বড় তরতরে ঝরঝরে। মাঝে মাঝে তাতে প্রসন্ন কৌতুকের কিরণ সম্পাত। স্নিগ্ধ অথচ গভীর শ্রদ্ধায় চর্চিত অরবিন্দের ছবিখানি ফুটে আছে তারি মধ্যে। কিন্তু তবু বলতে হবে, সে ছবি প্রচলিত অর্থে চিত্তাকর্ষক নয়, কেননা তা বহির্বিমুখ আত্মলীন ভাবুক একটি মানুষের রূপচিত্র।

অরবিন্দ তাই ছিলেন। কী ছিলেন, সেটা জানাই একটা বড় লাভ। দীনেন্দ্র কুমার স্বল্প পরিসরে তা আমাদের জানাতে পেরেছেন।

দীনেন্দ্র কুমারের সীমাবদ্ধতাও ছিল। তিনি সবিনয়ে (এবং মিথ্যাবিনয়ে নয়) জানিয়েছেন, অরবিন্দের বিরাট পাণ্ডিত্য বোঝার কোনো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। না, অরবিন্দের রাজনীতিও তিনি বুঝতেন না, বা বুঝতে চাইতেন না। অরবিন্দের পুস্তকাগারের 'অগণ্য' গ্রন্থস্তুপের মধ্যে বিপ্লববাদের সমর্থক কোনও গ্রন্থ কোনোদিন দেখতে পাননি। 'মহিমান্বিত ব্রিটিশ রাজ শক্তির প্রতি অবজ্ঞাসূচক কোনও উক্তি কোনোদিন তাঁহার মুখে শ্রবণও' করেননি। বস্তুত ইংরাজকে ভারত ছাড়া করিবার দুরভিসন্ধি যে কোনদিন তাঁহার মনে স্থান পাইয়াছিল – তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া ও দুই বৎসরের অধিক কাল তাঁহার সহিত দিবারাত্রি এক কক্ষে বাস করিয়া মুহূর্তের জন্যও তা বুঝতে পারেন নি। অরবিন্দকে তাঁর মনে হয়েছিল, 'নির্বিরোধ, উদার প্রকৃতি, ধর্মভীরু, দয়ার্দ্র হৃদয়, পরদুঃখকাতর, হিংসা বিদ্বেষ বর্জিত' মানুষ – তিনি যে ভীষণ বোমার ষড়যন্ত্রে বা জনক্ষয়কর কোনও অনুষ্ঠানে কখনো লিপ্ত থাকতে পারেন তা 'সম্পূর্ণ অসম্ভব', এবং তাঁর 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' বলে দীনেন্দ্রকুমারের মনে হয়েছিল।

দীনেন্দ্রকুমার যে সময় অরবিন্দের কাছে ছিলেন, সে সময় অরবিন্দ সত্যই বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন নি। যদি পড়তেনও দীনেন্দ্রকুমারকে নিশ্চয় তিনি সে বিষয়ে অবহিত করতেন না, কারণ দীনেন্দ্রকুমার কি ধরণের মানুষ তা বুঝবার মত লোকচরিত্র জ্ঞান অন্ততঃ অরবিন্দের ছিল। অরবিন্দের রাজনৈতিক ধারণা সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমারের ধারণার অগভীরতা ধরা পড়েছে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশে' লিখিত অরবিন্দের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য থেকে। 'কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটিই' মাত্র নাকি সেই প্রবন্ধগুলিতে দেখানো হয়েছিল। খুবই সুখের বিষয়, দীনেন্দ্রকুমার অরবিন্দকে 'ঐ সকল প্রবন্ধের মর্ম কি তাহা কখনো জিজ্ঞাসা' করেন নি। যদি করতেন এবং অরবিন্দ যদি উত্তর দিতেন তাহলে অবশ্যই ভয়ঙ্কর কিছু কথা শুনতেন, কারণ ঐ প্রবন্ধগুলিতে ভাবী বিপ্লবের ছন্দ বেজেছিল- অহিংস বিপ্লব নয়- 'অগ্নি ও রক্তস্নান' হয় যাতে, এমন বিপ্লব। 'কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটি', অরবিন্দ যা দেখিয়েছিলেন, তা আর কিছু নয়- কংগ্রেস বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, জমিদার ও আইনজীবীরা যার সাহায্যে স্বার্থোদ্ধার করছে – প্রলেটারিয়েটের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ নেই, ইত্যাদি।

সুতরাং অরবিন্দের পাণ্ডিত্য বা রাজনীতি, এমনকি অরবিন্দের ধর্ম-ধারণার বিষয়ে জানবার জন্য এই স্মৃতিকথাটি আমরা পড়ব না। খুবই বিস্ময়ের কথা, দু বছরের উপর একঘরে অরবিন্দর সঙ্গে বাস করেও দীনেন্দ্রকুমার পরবর্তী যোগী অরবিন্দের ধর্ম ভূমিকার কোনও পরিচয় দেননি। কিন্তু তা যদি না দিয়ে থাকেন তার একমাত্র কারণ তখনও অরবিন্দের মধ্যে যোগীর আবির্ভাব হয়নি, যদিও যোগীর উপাদানগত সমস্ত লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রকটিত ছিল। এবং সেই 'উপাদানের' উন্মোচন এই পুস্তকের একটি প্রধান মূল্য।

বইয়ের আরম্ভটি বড় সুন্দর। বিনা ভূমিকায় সরাসরি মূল বিষয়ে নেমে পড়েছেন লেখক স্বচ্ছন্দ সরসতায় :

"শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ এত অল্পদিনের মধ্যে এরূপ বিখ্যাত হইয়া উঠিবেন, সমগ্র ভারতের পুলিশবাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিপতিত হইবে এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার নর্টন সাহেব তাঁহাকে রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতের দরিদ্র প্রজার শোণিততুল্য সহস্র সহস্র মুদ্রা শাম্পেন-পানি অপেক্ষাও সহজে গলাধঃকরণ করিবেন, বোমার মামলা আরম্ভ হইবার পূর্বে একথা আমার কল্পনার অতীত ছিল...।"

দীনেন্দ্রকুমার যখন অরবিন্দের বাংলা শিক্ষক রূপে বরোদা গিয়েছিলেন তখন অরবিন্দ বিখ্যাত হননি, কিন্তু লেখক এইটুকু জেনে নিয়েছিলেন, অরবিন্দ 'প্রগাঢ় পণ্ডিত লোক', সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় গ্রীক ল্যাটিনে রেকর্ড নম্বর পেয়েছেন, এবং ৫/৬ বৎসর বয়স থেকে ১৮/২০ বছর পর্যন্ত একাদিক্রমে বিলাতে কাটিয়েছেন। সুতরাং ছাত্রের একটা চেহারা অগ্রিম কল্পনা করে নিয়েছিলেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক বন্ধুবর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের ন্যায় প্রকাণ্ড জোয়ান, চোখে চশমা, অধিকন্তু আপাদমস্তক হ্যাটকোট বুটে মণ্ডিত, মুখে বাঁকাবাঁকা বুলি, চক্ষুতে কটমট চাহনি, মেজাজ ভয়ঙ্কর রুক্ষ।

আর সাক্ষাতে কি দেখলেন?

"বলাবাহুল্য অরবিন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতে বড়ই নিরাশ হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, পায়ে শুঁড়ওয়ালা সেকেলে নাগরা জুতা, পরিধানে আমেদাবাদ মিলের বিশ্রী পাড়ওয়ালা মোটা খাদি, কাছার আধখানা খোলা, গায়ে আঁটো মেরজাই, মাথায় লম্বা লম্বা গ্রীবাবিলম্বিত বাবরিকাটা পাতলা চুল, মধ্যে চেরা সিঁথি, মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ, চক্ষুতে কোমলতাপূর্ণ স্বপ্নময় ভাব, শ্যামবর্ণ ক্ষীণদেহধারী এই যুবক

ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন, হিব্রু, গ্রীকের সজীব ফোয়ারা শ্রীমান অরবিন্দ ঘোষ। দেওঘরের পাহাড় দেখাইয়া যদি কেহ বলিত-ঐ হিমালয়!-তাহা হইলেও বোধহয় ততদূর বিস্মিত ও হতাশ হইতাম না!"

'হতাশা' কেটে অতঃপর শ্রদ্ধার সঞ্চার হল, কিভাবে বুঝলেন 'অরবিন্দ এ-পৃথিবীর মানুষ নহেন' তাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য - এবং পাঠককে তা জানতে হলে এই গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টে নিতে হবে।

দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনা থেকে এই কালের অরবিন্দের যে-রূপ দেখি তাতে দুটি ছবি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে – প্রথম ছবি – সুখে বা কষ্টে অনুদ্বিগ্ন এক মানুষের, দ্বিতীয় ছবি- গ্রন্থনিমজ্জিত তদ্‌গত মানুষের। এই কালে অরবিন্দ যদি তপস্বী হয়ে থাকেন, দীনেন্দ্রকুমারের বর্ণনা অনুযায়ী সে তপস্যার বেদীপীঠ গ্রন্থাগার।

অরবিন্দের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা আমরা এই রচনায় পেয়েছি। পোশাকে বা খাদ্যে কোনও বিলাসিতা তাঁর ছিল না- প্রখর শীতে গ্রীষ্মেও নির্বিকার থাকতেন। অর্থ সম্বন্ধে তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। অরবিন্দের পাচক ও ভৃত্যদের মুক্ত স্বাধীন আচরণের কৌতুকজনক বিবরণ লেখক দিয়েছেন।

অরবিন্দ অল্পাহারী ছিলেন, তবে নিরামিষাশী নন। মাছ মাংস সবই খেতেন। নিয়মিত ইসবগুল খেতেন, সিগারেটও খেতেন। অরবিন্দের বন্ধু কম ছিল, তবে মাঝে মাঝে গল্প করতে ভালবাসতেন এবং তখন কোমল হাসিতে ভরে থাকত মুখ। ব্রাহ্ম পরিবারের মানুষ হলেও থিয়েটারের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন না। তিনি সাধারণভাবে জনপ্রিয় ছিলেন না, যদিও ছাত্র ও শিক্ষক মহলে তাঁর প্রচুর খ্যাতি ছিল। আর বরোদার রাজা যেহেতু তাঁকে খাতির করতেন তাই প্রায়ই সুপারিশ প্রার্থীর দল তাঁর কাছে হাজির হত। অরবিন্দ আত্মমর্যাদা বজায় রেখে রাজার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, এমনকি কোনও কোনও সময় আহূত হয়েও রাজসকাশে যান নি কাজ ছিল বলে, অথচ এই রাজার প্রতি (সয়াজী রাও গায়কোয়াড়) তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধাও ছিল।

অরবিন্দের ধর্ম বিশ্বাসের কোনো কথা দীনেন্দ্রকুমারের লেখাতে না পাওয়া গেলেও জ্যোতিষে প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় পেয়েছি। "মানব জীবনের উপর গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া জাতকের জীবনের শুভাশুভ জানিতে পারা যায়, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।" সুতরাং লেখক যখন তাঁর স্বগ্রামবাসী 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক, জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত' কালীপদ ভট্টাচার্যকে দিয়ে অরবিন্দের কোষ্ঠী তৈরি করিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তখন অরবিন্দ রাজী হয়েছিলেন; এমন কি প্রতিদিবসের ফলাফল জানা যায় এমন বিস্তারিত কোষ্ঠী করিয়ে নেবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কালীপদ ভট্টাচার্যের কাছে অরবিন্দের কোষ্ঠী গণনার ফল শুনে দীনেন্দ্রকুমার চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন- 'তোমার ছাত্রটি অসাধারণ ব্যক্তি; তিনি রাজার প্রিয়পাত্র হইলেও তাঁহার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে; গার্হস্থ্য জীবনের সুখ তাঁহার অদৃষ্টে বড় অধিক নাই।' এই গণনা বিস্ময়কর বটে, কারণ "সেই সময় শ্রী অরবিন্দ বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শীঘ্রই তিনি বিবাহ করিবেন; বরোদায় তিনি অনেক টাকা বেতনের চাকরি করেন; তাঁহার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ। তাঁহার অদৃষ্টে গার্হস্থ সুখ নাই!"

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়- দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় জ্ঞানতপস্বী অরবিন্দের ছবিই গভীর রঙে আঁকা হয়েছে। অরবিন্দ রাশি রাশি বই কিনতেন, আর প্রায় দিবারাত্র তাতে ডুবে থাকতেন। "এরূপ পাঠানুরাগ আমি কাহারও দেখি নাই। অরবিন্দ রাত্রি একটা পর্যন্ত মশক দংশন উপেক্ষা করিয়া টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া জুয়েল ল্যাম্পের

আলোকে সাহিত্যালোচনা করিতেন। তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধদৃষ্টি অবস্থায় একইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট দেখিতাম। যোগ নিমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁহার হুঁশ হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, ইতিহাস, দর্শন পাঠ করিতেন, তাঁহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দর পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরাজী, গ্রীক, ল্যাতিন, হিব্রু প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক, তাহার পরিচয় আমার জানা ছিল না। হোমারের ইলিয়াড, দান্তের মহাকাব্য, আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের গ্রন্থাবলী সমস্তই অরবিন্দের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। রুশীয় ভাষার তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন কি চিত্রশিল্পে, কি সাহিত্যে রুশিয়া একদিন ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

অরবিন্দ ক্লাসিক সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত, আমরা জানি – দীনেন্দ্রকুমারের রচনা থেকে অধিকন্তু জেনেছি- পৃথিবীর ক্লাসিক সাহিত্যে বাল্মীকির রামায়ণকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তিনি রামায়ণ মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদও শুরু করেছিলেন। সে কাজ তাঁর আগে খানিক করেছিলেন সুবিখ্যাত রমেশ দত্ত। রমেশ দত্ত অরবিন্দের অনুবাদ দেখে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার থেকে বড় প্রশস্তি বোধহয় সম্ভব না- "তোমার এইসব কবিতা দেখিয়া, রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। তোমার এই কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনই ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে আমি ছেলেখেলা করিয়াছি।"

দীনেন্দ্রকুমার রমেশ দত্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করার পরে যোগ করে দিয়েছেন- "অথচ রমেশ দত্ত মহাশয়ের সেই রামায়ণ মহাভারতের (অনুবাদের) প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনায় ইংলন্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিকের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়াছিল।"

একটা জিজ্ঞাসা থেকে যাচ্ছে- যে মাতৃভাষা শেখবার জন্যে অরবিন্দ দীনেন্দ্রকুমারকে শিক্ষক করে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই বাংলা ভাষাশিক্ষার কতদূর হয়েছিল? বাংলা তিনি শিখেছিলেন- সাহিত্য উপভোগের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল-যদিও সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অরবিন্দ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরাজী ভাষারই লেখক। তাহলেও এই কালে অর্থাৎ প্রথম পরিচয়ে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি দাঁড়িয়েছিল? বিশেষ সংবাদ পাই না, কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ মাত্র পাই। অরবিন্দ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দীনবন্ধুর সধবার একাদশী, লীলাবতী, তারকনাথের স্বর্ণলতা পড়েছিলেন। সাধু বাংলা ভাল বুঝতেন, কিন্তু চলতি বাংলার ইডিয়ম বুঝতে অসুবিধায় পড়তেন। স্বর্ণলতার গার্হস্থচিত্র অরবিন্দকে মুগ্ধ করেছিল। "স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবে এরূপ ঝংকার শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।" রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তখন তিনি পড়েছিলেন, 'এই কোকিল কবির প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রকাশের যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইত না।'

অরবিন্দ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অনুরাগী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তিনি নিজেই পড়তেন ও 'বেশ বুঝিতে পারিতেন।' "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। বলতেন, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অতীত ও বর্তমানের ব্যবধানের উপর সুবর্ণ সেতু।"

অরবিন্দের জীবনী পাঠক মাত্রেই জানেন তাঁর উপর বঙ্কিমচন্দ্রের কী গভীর প্রভাব ছিল। সে প্রভাব সাহিত্য থেকে রাজনীতিতে পৌঁছেছিল। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে অরবিন্দ' একটি বৃহৎ প্রসঙ্গ- তার মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা এখন আমার নেই। কিন্তু আমরা জানি, দীনেন্দ্রকুমার যে সময়ের কথা বলছেন (১৮৯৮-১৯০০), তার চার পাঁচ বছর আগেই অরবিন্দ বঙ্কিমের দেহত্যাগের সূত্রে বিস্তারিত এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ইংরেজী ভাষায়। সে প্রবন্ধগুলি নবীন যুবকের লেখা- উষ্ণ এবং সশব্দ ভঙ্গি কিছুটা সেখানে আছে কিন্তু বাংলার 'নবজন্ম' এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বাক্য আছে যার থেকে উদাত্ত গভীর রচনা প্রায় দেখা যায় না। ক্লাসিক্যাল গাম্ভীর্যের সঙ্গে রোমান্টিক আবেগ মিশে গিয়েছিল সেই রচনায়। আর সেকি আহত মর্যাদার স্পর্ধাযুক্ত ঘোষণা বঙ্কিমচন্দ্রের 'অসম্মানের' বিরুদ্ধে! 'বঙ্কিম বাঙলার স্কট'- আত্মভ্রষ্ট, পরমুখাপেক্ষী জাতি এই কথাটি বলতে পেরে সেদিন কি পুলকিত! কথাটি শুনে লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল অরবিন্দের। এক দ্বিতীয় শ্রেণীর রসবোধহীন স্কচ সাহিত্যিক- নারী চরিত্র আঁকার সময়ে যিনি কতকগুলি পুতুল ভিন্ন আর কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি- তাঁর সঙ্গে সমকালীন পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর এক প্রতিভার তুলনা! বঙ্কিমের ঐ তথাকথিত সম্মানের চেয়ে বড় অসম্মান আর কিছু সম্ভব নয়। ধিক্কার দেবার অধিকার অরবিন্দের অবশ্য ছিল- কারণ তিনি বিদেশী সাহিত্যের নামজাদা ছাত্র, এবং এমন ইংরাজী জানতেন যে, 'বিলেতের মেথরানীও গড় গড় করে ইংরেজী বলে, অহো কি আশ্চর্য!'- এই সহর্ষ উন্মাদনা বোধ করার প্রয়োজন তাঁর হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে অরবিন্দের ঐ প্রাথমিক রচনা প্রায় আশি বছর পরেও অংশতঃ অনতিক্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে অরবিন্দ তাঁর বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের সমকালীন সাহিত্যকে প্রথম চিনেছিলেন। আই সি এস পড়ার সময়ে নাকি তিনি মূল বাংলায় বঙ্কিম পড়েছিলেন। তাই হয়ত দীনেন্দ্রকুমার তাঁকে সহজেই বঙ্কিম পড়তে দেখেছিলেন, চার বৎসর পরে।

অরবিন্দের যারা জীবনী লিখবেন তাঁদের পক্ষে এবং অরবিন্দকে সহজরূপে কাছ থেকে দেখবার ইচ্ছা যারা করবেন, তাঁদের পক্ষেও, দীনেন্দ্রকুমারের রচনা অবশ্য পাঠ্য।

দীনেন্দ্রকুমার তাঁর বইটি শেষ করেছেন বিচিত্রভাবে, মনে হয় কিছুটা অসংলগ্নভাবে। শেষের দিকে তিনি অরবিন্দ-প্রসঙ্গ ছেড়ে বরোদায় নানা অভিজ্ঞতার বর্ণনায় মেতে গিয়েছিলেন। একবার বিজয়াদশমীর সময়ে রাজকীয় শোভাযাত্রার অগ্রে বৃহৎ অশ্বে উপবিষ্ট, দাড়ি গোঁফহীন নিরস্ত্র এক সৈনিকের দীর্ঘ মূর্তি তিনি দেখেন। গম্ভীর মর্যাদা সম্পন্ন সেই অশ্বারোহী কিন্তু হিন্দু নন, জাতিতে মুসলমান। মুসলমান অথচ শ্মশ্রুগুম্ফহীন? পিছনের ইতিহাস চমকপ্রদ। ইনি বরোদার ভূতপূর্ব সেনাপতি; এঁর প্রভু ছিলেন মলহররাও গাইকোয়াড়। ইংরেজ রেসিডেন্টকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। মহারাজের এই অসম্মানের বিরুদ্ধে এই সেনাপতি সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন। সে বিদ্রোহ নিশ্চিত আত্মঘাতী হবে জেনে মলহররাও সম্মত হননি। তখন সেনাপতি রাজার পদতলে তরবারি বিসর্জন দিয়ে ঘরে ফিরেছিলেন। ঘরে ছিলেন তাঁর তেজস্বিনী বৃদ্ধা জননী। পুত্র নিমকের মান রাখেনি- জননী বলেছিলেন-ধিক! বলেছিলেন- ঐতিহাসিক বীরযুগের রমণীর মতই- "আর কিছু করতে না পারিস, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করতে পারিস তো! তা না করে যখন হাতিয়ার ছেড়ে চলে এসেছিস, এখন তোর আর দাড়ি গোঁফ রাখা শোভা পায় না। তুই দাড়ি গোঁফ কামিয়ে পুরুষের নিদর্শন বিসর্জন কর!"

তারপর থেকে এই পুরুষবীর মুণ্ডিত মুখ, কৃপাণহীন- শোভাযাত্রা অগ্র শোভামাত্র! সেই সুবিশাল অসম্মানিত মর্যাদার দিকে তাকিয়ে কেন জানি দীনেন্দ্রকুমারের চোখে ভেসে উঠেছিল 'অরবিন্দের সৌম্য শান্তমূর্তি!'

অরবিন্দ রাজদ্রোহী হতে পারেন- একথা কখনও বিশ্বাসই করতে পারেনি দীনেন্দ্রকুমারের সাবধানী সতর্ক হিসাববুদ্ধি। কিন্তু তাঁর আত্মা আর্তনাদ করে বলেছিল- না না, মিথ্যা মিথ্যা! সেই যন্ত্রণাকাতর প্রাণরেখাই রচনা শেষের অসংলগ্ন ভাবনার মধ্যে আঁকাবাঁকা হয়ে ফুটে উঠেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ : মহান রাষ্ট্রহিতৈষী **শ্রী চিত্তরঞ্জন পাত্র**

স্বামী বিবেকানন্দ এমনই একজন ক্ষণজন্মা মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখার মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার অবসর পাওয়া অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের। তাঁর ১১৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার বিনম্র নিবেদন সামান্য হলেও আন্তরিকতায় ভরপুর।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা মহান তপস্বী সন্ন্যাসী রূপে নয়, বরং পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভগবতী স্বরূপা মা সারদার যশস্বী পুত্র-শিষ্য রূপে অধিক মহত্ব দিয়ে থাকি। তিনিই প্রথম পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রকৃত জ্ঞাতা ও ব্যাখ্যাতা রূপে দণ্ডায়মান হয়ে শিকাগোর মহাবিশ্বধর্ম সম্মেলনে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন, ভারতের ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি চিরন্তন ও শাশ্বত। তাঁর ১১৮ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে সর্বাধিক মহত্ব এজন্য দেওয়া যেতে পারে কারণ তিনি ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা সামাজিক ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য যুবাবর্গকে আহ্বান করে বলেছিলেন, জননী জন্মভূমিকে ভারতমাতা রূপে সংস্থাপিত করে তাকে আরাধ্যাদেবীর মর্যাদা দিতে পারলে ভারত আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবে।

স্বামীজীর সেই উদাত্ত আহ্বান আজ বারবার মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, আগামী পঞ্চাশ বর্ষ শুধুমাত্র জন্মভূমিকে ভারত-মাতা রূপে আরাধনা করার প্রয়োজন আছে। ঐ সময়ের মধ্যে যদি দেবদেবীরা আমাদের মস্তিষ্ক থেকে অন্তর্হিত হন তাহলে আমাদের বিশেষ কিছু হানি হবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের সম্পূর্ণ ধ্যান শুধুমাত্র এক ঈশ্বরের প্রতি ন্যস্ত করা উচিৎ, তিনি ভারতমাতা রূপী ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। ভারতের সর্বত্র তাঁর হাত পা এবং কান বিধৃত হয়ে আছে। আর একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে অন্য সব দেব-দেবী বর্তমানে নিদ্রিত হয়ে আছেন। যেসব দেব দেবীদের আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, তাঁদের পিছনে অযথা না দৌড়ে, যে বিরাট দেবতাকে আমাদের চারদিকে প্রতিদিন দেখছি তাঁকেই পূজা করা উচিত নয় কি? যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেবতাকে পূজা করতে পারবো তখনই আমরা অন্য দেবদেবীদের পূজার্চনা করার যোগ্য হবো। যেখানে আধ মাইল চলার শক্তি নেই, সেখানে যদি আমরা শ্রীহনুমানজীর মত এক লাফে সমুদ্র পারের ইচ্ছা প্রকাশ করি, তা কি কখনো সম্ভব হবে? স্বামীজী এইরূপ উদাত্ত আহ্বান করেছিলেন সেই সময়ে মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) এক সম্মেলনে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ।

কৈশোরাবস্থায় বিভিন্ন আচার্য, ধর্মগুরু, এবং আধ্যাত্মিক সাধু সন্তদের কাছে সঠিক উত্তর না পেয়ে তিনি (অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ দত্ত) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছেন?" যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা দিতে পারেন নি, অকল্পনীয় ভাবে সেই উত্তর পেলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, যেমন করে তোমাকে দেখছি।" এমন জবাব এর আগে আর কারো কাছেই পান নি, যে গুরুর সন্ধানে তিনি এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই গুরুর পদতলে এসে পূর্ণতা পেলেন নরেন, যিনি ভবিষ্যতে বিশ্বের দরবারে পরিচিত হবেন স্বামী বিবেকানন্দ নামে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বিভিন্ন স্থান পদব্রজে ভ্রমণের পর মাদ্রাজের দক্ষিণ সমুদ্রতটস্থিত কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে তিনদিন তিনরাত্রি সমাধিস্থ থেকে এক অসাধারণ শক্তি অর্জন করেছিলেন যার দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছিলেন, ঐ সঙ্গে এক গৌরবশালী ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন।

স্বামীজী সামাজিক কর্মবিমুখ সেই সমস্ত চাতুর্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রত্যাখ্যান করতেন যার দ্বারা মানুষ গেরুয়া কাপড় পরে সন্ন্যাসী হয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য তপ, ধ্যান, আধ্যাত্মিক আচরণ করবে বা হিমালয়ে গিয়ে ধর্মমঠ তৈরি করে শান্তিতে জীবন যাপন করতে ব্যস্ত থাকবে। স্বামীজীর মতে ঈশ্বর চিন্তা অপেক্ষা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ চিন্তা অধিকতর মাহাত্মপূর্ণ ছিল। তাঁকে কষ্ট দিত ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে মতানৈক্য; নানা শ্রেণী বৈষম্যে খণ্ডিত সমাজ ব্যবস্থা; পুরাতন ঐতিহ্য ভুলে জ্ঞানপরম্পরাকে অবহেলা করে দেশবাসীর অন্তর্দ্বন্দ্বে নিঃশেষ হতে থাকা। তিনি মনে করতেন আমাদের দেশের দারিদ্র্য জাতিভেদ এবং সামাজিক অবনতির মূল কারণ বহুশতবর্ষ যাবত বিদেশী শক্তির কাছে দাসত্ব। এই অসঙ্গতিকে নির্মূল করাই প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রধান কর্তব্য।

১৯০১ সালে ঢাকাতে প্রদত্ত ভাষণে স্বামীজী বলেছিলেন, প্রাচীন গৌরবগাথা তখনই বাস্তবরূপ নিতে সক্ষম হবে যখন বর্তমান অব্যবস্থাতে দুঃখিত না হয়ে ভবিষ্যতকে রূপায়ন করার জন্য দেশবাসী আশানুরূপ সচেষ্ট হবে। স্বামীজীর ভাষণ শুধু মৌখিক ছিল না। আচারে, বিচারে, সার্বিক ব্যবহারে তিনি তাঁর বাণীকে রূপ দিয়েছিলেন। তিনি নিম্নবর্গের হুঁকোতে তামাক খেয়েছেন, তাদের সাথে একত্রে বসে ভোজন করেছেন। কেবল মুচী-মেথর বা অন্য নিম্নবর্গের মানুষ নয়, তিনি মুসলিমের হাতে রান্না করা খাবারও তৃপ্তির সঙ্গে খেতেন। ধনী অপেক্ষা নির্ধন, উচ্চবর্গ অপেক্ষা নিম্নবর্গের মধ্যে মানবতার বিকাশে তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সব জাতির সম্মিলনের দ্বারা দেশের ও বিশ্বের কল্যাণ সম্ভব।

তাঁর জন্মের সার্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত। আজ যদি স্বামীজির কর্ম ও শিক্ষা নিয়ে পর্যালোচনা করি তাহলে এই কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে, হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বিদেশি শক্তির দাসত্বপাশে বদ্ধ হয়ে ভারতের জনগণ যে আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এমন এক মহাপুরুষ যিনি সেই আত্মশক্তিকে পুনর্জাগরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের অবসরে। স্বামীজী বলেছিলেন, বেদ-বেদান্ত বা আমাদের সনাতন ঐতিহ্য থেকে যা কিছু শিক্ষণীয়, প্রয়োজনানুসারে তাকে কিছু পরিবর্তন করে গ্রহণ করবো, যেমন কোন বৃক্ষের শুষ্ক ডালপালা অপ্রয়োজনীয় মনে হলে কেটে ফেলতে হয় নতুন শাখার উদ্গমের প্রয়োজনে। পাশ্চাত্য এবং অন্য স্রোত থেকে গ্রহণযোগ্য নবীন বিচার অবশ্যই নিতে হবে, তবে সদাসর্বদা স্মরণে রাখতে হবে এইরূপ করার ফলে মূল বৃক্ষের যেন ক্ষতি না হয় বরং ঐ বৃক্ষ আরও জীবন্ত আরও শক্তিশালী হয়।

এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় প্রাচীন মুনি ঋষিদের ঐতিহ্য ও পরম্পরার ধারক ও বাহক। তাই তাঁর জীবন দর্শনের মূল মন্ত্র : "আত্মানো মোক্ষার্থ জগদ্ধিতায় চ"। ভারতীয় জ্ঞান দর্শনের এই মূলসূত্র স্বামীজীর জীবনের ধ্যেয় এবং মূলমন্ত্রও। সনাতন

ধর্মের মহান পরম্পরাকে শিকাগোর মহাধর্ম সম্মেলনে নিজের ভাষণে উল্লেখ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের শিক্ষা প্রচার করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যুবাবর্গকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেকারণেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা রূপে স্বীকার করেছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ কেবলমাত্র একজন ধর্মগুরু বা সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রহিতৈষী মানবতাপ্রেমীও।

বিদ্রোহ **শ্রী প্রকাশ অধিকারী**

শিশুটি তখনও খেলে চলেছে
মা-র মৃতদেহের সাথে
ইস্টিশানে প্লাটফর্মের 'পরে ---
জানে না শিশু, মা আর নেই।

সময় হারিয়েছে খেই ;
বাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল তাদের ---
জানেই না আশ্রয়টা আজ কই?
কত শিশু হলো এমন আশ্রয়হারা
করোনা-ঝড়ে বিশ্ব জুড়ে এই বেলা
এ শুধু প্রকৃতির প্রতিশোধ, প্রকৃতির খেলা?
মানি না। মানি না।
সর্বংসহা আমাদের প্রকৃতি-মা এত নিষ্ঠুর?
পারে না, হতে পারে না।
অন্ধ যারা পাষাণ-হৃদয়
লুটতে চেয়েছে যেন-তেন-প্রকারেণ
জীবনের সর্বস্ব, প্রকৃতির সব সম্পদ, ধন, মান ---

দায়ী তারা,
তারাই দায়ী ---
সমস্ত পাপের নিঃসংশয় ভাগী।

মাতৃহারা শিশুটিই আজ
জাগিয়ে দেবে স্থির নিশ্চয়
ঘুমিয়ে পড়া এই বিশ্ব-প্রাণ।

দাও গো আমায় **স্বামী তারানন্দ**

দাও সে রতন।
দাও গো আমায় সাধুতা আর
দাও শুদ্ধ মন।।

দাও গো আমায় শুদ্ধ চিন্তা
মঙ্গল কারণ।

DO NOT COPY

সবার মঙ্গল করি যেন
সারাটি জীবন।।

দাও গো আমায় শুদ্ধ জ্ঞান
দাও বৈরাগ্য আর।
দাও গো আমায় সরলতা
বিবেক বিচার।।

দাও গো আমায় আশীষ বারি
দাও তব শরণ।
অন্তিম কালে লভি যেন গুরু
তোমার শ্রী চরণ।।

মুখোশ ছিঁড়ে

সুনন্দন ঘোষ

এ কেমন বেঁচে থাকা মুখোশের আড়ালে?
প্রাণের বন্ধু খবর নেয় দরজার বাইরে থেকে,
মনের মানুষ ভীত শঙ্কিত আলিঙ্গনে!
পরিচয়-সঙ্কটে মুখ আর মুখোশ।

স্কুলের দরজায় পা রাখার পর অদৃশ্য একটা মুখোশ
সেঁটে গেছিলো সারাজীবনের জন্য।
হোম-টাস্ক আর পরীক্ষার ভারে
নীরবে শেষ হয়ে গেলো ছেলেবেলা।
তারপর থেকে আর সত্যি কথার অবকাশ নেই।
সত্যি ভালবাসার অবসর নেই।
ঠোঁটের আগায় বর্ণগুলো শব্দ হয়,
শব্দগুলো চলে যায় বোধিহীন বাক্যান্তরে।
কথার পিঠে কথা ঘুরতে থাকে জপের মালার মতো।
মুখোশটাই মুখ হয়ে গেলো।

শেষ বিকেল এখন,
অন্ধকার নামতে চলেছে চোখের পাতায়,
শাঁখের শব্দে কাঁপছে জলের বুক।
রূপকথার আশ্চর্য প্রদীপ খুঁজছি আমি, যা আমাকে
নিয়ে যাবে আমার প্রথম ভোরে।
ফিরে পাবো
সকালের রান্নাঘরে মায়ের খুন্তির শব্দ,
বিকেলের ছাদে মালবিকার চোখে সূর্যাস্ত,
বাবার বুকে মুখ ঘষার রাত্রি।

রংচটা মুখোশগুলো পড়ে থাকবে চৌকাঠের বাইরে।
তারপর একদিন বৃষ্টির জলে ভাসতে ভাসতে
হারিয়ে যাবে স্মৃতির দিগন্তে।

DO NOT COPY